

মতামত

সহকারী কমিশনারদের [নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট] পরিচয় দেওয়া কতটা যৌক্তিক



প্রতিবেদক: Dhaka Probe

প্রকাশের তারিখ: শনিবার, ১১ জুলাই ২০২৬, ১০:৩৩ AM



বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তার তুলনায় একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিয়ে খুব কমই কথা হয়। প্রশ্নটি হলো—একজন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা আসলে কে? প্রতিবার বিসিএস পরীক্ষার সুপারিশপ্রাপ্তির ফলাফল শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে [বিভ্রান্তিকর] যে বিষয়টি দেখি, তা হলো নতুন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিজেকে [নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট] হিসেবে জাহির করা। তিনি কি একজন সহকারী কমিশনার, নাকি একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট? প্রথম দেখায় প্রশ্নটি তুচ্ছ মনে হতে পারে।

অনেকেই বলবেন, এতে এমন কী আসে—যায়? কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সত্য হলো, রাষ্ট্রে পরিচয় কখনো নিরপেক্ষ নয়। রাষ্ট্র কোনো কর্মকর্তাকে যে নামে চিহ্নিত করে, সেই নামই তাঁর সাংবিধানিক অবস্থান, ক্ষমতার উৎস ও জবাবদিহির সীমা নির্ধারণ করে। ফলে [পদ] ও [ক্ষমতা]কে এক করে দেখার প্রবণতা কেবল ভাষাগত ভুল নয়, এটি সাংবিধানিক দর্শনেরও প্রশ্ন।

আজকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিংবা বিভিন্ন পরিচিতিমূলক লেখায় প্রায়ই দেখা যায়, [বিসিএসে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে

সুপারিশপ্রাপ্ত। বাস্তবে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এমন কোনো পদে কাউকে সুপারিশই করে না।

আইন কী বলে? বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী। এই বিধিমালায় প্রতিটি ক্যাডারের প্রবেশ পদ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারের ক্ষেত্রে সেই পদ সহকারী কমিশনার। নিয়োগপত্রেও থাকে [সহকারী কমিশনার (শিক্ষাবিশ)]।

পিএসসি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই পদেই সুপারিশ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভাষায়, একজন নবীন প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা প্রথম দিন থেকেই [সহকারী কমিশনার], [এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট] নন। তাহলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোথা থেকে এল? এর উত্তর রয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০ ধারায়। ধারা ১০(১) সরকারকে জেলা ও মহানগর এলাকায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো ১০(৫) ধারা, যেখানে বলা হয়েছে, সরকার যদি প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করে, তবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (প্রশাসন) কর্মরত যেকোনো কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করতে পারে এবং তাঁর ওপর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। এখানে দুটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—[অ্যাপয়েন্ট] ও [কনফার পাওয়ারস]। অর্থাৎ সরকার একজন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব দিতে পারে এবং সেই ক্ষমতা দিতে পারে; কিন্তু এই বিধান কোথাও বলে না যে বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ামাত্রই কেউ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। বরং এখানেই সরকারের একটি পৃথক আইনগত আদেশের প্রয়োজন হয়।

এই পুরো বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে প্রশাসনিক আইনের একটি বহুল স্বীকৃত নীতি—[ডেলিগেশন অব পাওয়ার ডাজ নট ক্রিয়েট আ নিউ অফিস], অর্থাৎ ক্ষমতা অর্পণ নতুন পদ সৃষ্টি করে না। রাষ্ট্র একজন মানুষকে একটি পদ দেয়, আবার সেই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতাও দিতে পারে; কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতা পাওয়া মানেই তাঁর মূল পদ পরিবর্তিত হয় না।

একজন জেলা প্রশাসক নির্বাচনকালে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দেন না। কোনো সচিব কমিশনের চেয়ারম্যান হলেও নিজের পদবি সচিবই রাখেন। সিআরপিসির ১৪ ধারা অনুযায়ী কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হলেও তিনি নিজের পরিচয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দেন না। কারণ, ক্ষমতা তাঁর পরিচয় নয়; পরিচয় তাঁর পদ। এই সহজ নীতিটি প্রশাসন ক্যাডারের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখানেই সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংবিধান রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। এটি কোনো অলংকারমূলক ঘোষণা নয়; বাংলাদেশের সাংবিধানিক দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। দীর্ঘদিন এ নির্দেশ কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত মাসদার হোসেন মামলায় আপিল বিভাগ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং কার্যকর পৃথক্করণের নির্দেশনা প্রদান করে।

পরবর্তী সময়ে বিচার বিভাগ পৃথক হয়। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য [নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট] পরিচয় বহাল থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে [ম্যাজিস্ট্রেট] শব্দটি আবারও নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে মিশে যায়। এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দর্শনের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বিচারিক কর্মকর্তা। ব্রিটিশ ভারতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কালেক্টর একই ব্যক্তি ছিলেন; কারণ, তখন প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা পৃথক ছিল না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা থেকে সরে এসেছে। বাংলাদেশও বিচার বিভাগ পৃথক করেছে। তারপরও প্রশাসনিক প্রয়োজনে [নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট] ধারণাটি রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক প্রয়োজন কখনো সাংবিধানিক নীতিকে

প্রতিস্থাপন করতে পারে না। একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিচারিক প্রকৃতির সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু তাতে তিনি বিচারক হয়ে যান না; একইভাবে তাঁর মূল পদও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যায় না।

এখানেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে—যদি সহকারী কমিশনার হওয়াই আইনগত পরিচয় হয়, তবে কেন অনেক কর্মকর্তা নিজেদের পরিচয়ের শুরুতেই “এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দটি ব্যবহার করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? এটি কি কেবল সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন, নাকি ঔপনিবেশিক আমলের “ম্যাজিস্ট্রেট” পরিচয়ের প্রতি একধরনের মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ?

ব্রিটিশ শাসনামলে “ম্যাজিস্ট্রেট” ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রতীক। বিচার বিভাগ পৃথক হলেও সেই প্রতীকী মর্যাদার আকর্ষণ পুরোপুরি বিলীন হয়েছে—এমনটি বলা কঠিন। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ কখনো আইনি পরিচয়ের বিকল্প হতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা তাঁর আইনগত অবস্থানে, ধার করা ক্ষমতায় নয়। আজ সরকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলে, আগামীকাল তা প্রত্যাহারও করতে পারে; কিন্তু সেই কর্মকর্তা সহকারী কমিশনারই থাকবেন। এই একটি উদাহরণই প্রমাণ করে—ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী, পদ স্থায়ী।

সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার জন্য পৃথক সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারণ করেছে, অন্যদিকে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবেই দুটি সার্ভিস পৃথক। তাহলে পরিচয়ের ক্ষেত্রে সেই পৃথক্করণ অস্পষ্ট করার যৌক্তিকতা কোথায়?

আইনের ভাষা কখনো অস্পষ্ট হতে পারে না। রাষ্ট্র যদি কাউকে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়, তবে তাঁর পরিচয়ও সেটিই হওয়া উচিত। আর যদি সরকার সত্যিই “নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট” নামে একটি স্বতন্ত্র পদ সৃষ্টি করতে চায়, তবে সেটি নিয়োগবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করুক, সরকারি গেজেটে সেই পদ সৃষ্টি করুক এবং পিএসসি সেই পদে নিয়োগের সুপারিশ করুক। কিন্তু তা না করে একদিকে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া, অন্যদিকে সামাজিকভাবে “নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট” পরিচয়কে উৎসাহিত করা আইনগত স্পষ্টতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেবল আদালতের দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সাংবিধানিক সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা প্রশাসনিক পরিচয়ে পরিচিত হবেন, বিচারকেরা বিচারিক পরিচয়ে। দুই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা, ভূমিকা ও সাংবিধানিক ভিত্তি ভিন্ন। এই সীমারেখা যত স্পষ্ট হবে, আইনের শাসন তত শক্তিশালী হবে। প্রশাসনের শক্তি বিচারিক পরিচয় ধার করে বাড়ে না; বরং নিজের সাংবিধানিক পরিচয়ে অবিচল থাকলেই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও তখনই পূর্ণতা পায়, যখন “ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দটি ক্ষমতার প্রতীক নয়; বরং বিচারিক দায়িত্ব ও আইনের শাসনের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা তার নিজস্ব সাংবিধানিক পরিচয়ে, ধার করা পরিচয়ে নয়। সহকারী কমিশনার যদি সহকারী কমিশনার হিসেবেই গর্ব বোধ করেন এবং বিচারক বিচারক হিসেবেই, তবেই সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের প্রকৃত চেতনা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে। পদ ও ক্ষমতার এই মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত সম্মান এবং সাংবিধানিক শাসনের অপরিহার্য শর্ত।

লেখক: শামস নজিব



সরকারি কর্মচারী ইস্যুতে কালো সাংবাদিকতা?
সাংবাদিকতার কোনো রং হয় না। উল্লেখ্য শতাব্দীর শেষদিকে এর ওপর কিছুটা হালুদা রংয়ের আঁচড় পড়ে। সময় বদলেছে।
গণমাধ্যমে গৌণ হয়ে কখনো-সখনো তা হয়ে...



খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন
স্বল্প সময়ে অধিক ফলন দিতে সক্ষম নতুন ধানের জাত অবমুক্ত।



চা শিপের উন্নয়নে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা সরকারের
রপ্তানি বাড়াতে ও শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।



নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে রাষ্ট্রপতির সংলাপে আমন্ত্রণ
সব রাজনৈতিক দলকে পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে বঙ্গভবন সূত্রে জানা গেছে।

